উজ্জ্বল সিংহ

উচ যুগ-কুচে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস

পদাবলি

এক

'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'পদ' শব্দের বহুবিধ অর্থের মধ্যে একটি হল : 'বৈষ্ণবভক্তরচিত গান'; তার সঙ্গে 'আবলি', (বিকল্প বানান : আবলী : অর্থ : সজাতীয়বস্তুর ক্রমবিন্যাস) যোগ করে, পদাবলি। অর্থাৎ পদসমূহ; 'পদ' শব্দের আর-এক অর্থ, 'বিভক্ত্যন্ত শব্দ'; পরে অবশ্য ছন্দের যতিযুক্ত একটি সম্পূর্ণ পদক্ষেপকে পদ বা পাদ বলা হতে থাকে। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন : "পদাবলী শব্দটি দেখতে সংস্কৃতের মতো হলেও আসলে তা নয়, সংস্কৃত সম্ভাব্য পদাবরিক শব্দের (অর্থ-পদাভরণ, পদাবরণ নুপুর; শব্দটির আধুনিক রূপ হল 'পায়েল') প্রাকৃত রূপান্তর (পআআরিঅ) থেকে সংস্কৃতায়িত রূপ। শব্দটির প্রয়োগ প্রথম মিলেছে জয়দেবের গীতগোবিন্দের বন্দনা গানে। জয়দেবের এই প্রয়োগ থেকেই 'পদসমূহ' অর্থাৎ কবিতার ছত্র-সমাবেশ একটি সম্পূর্ণ গীতিরচনা—এই অর্থ এসে গেল।" বিশিষ্টার্থে, গীতধর্মী নাতিদীর্ঘ কবিতাকে পদ বলা হয়ে থাকে। এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ 'গীতিকবিতা' বলতে বৈষ্ণব-পদাবলিকেই বোঝায়। পদাবলির আলোচনায় অবশ্য শাক্ত-পদাবলিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, তবে তার স্থান বৈষ্ণব-পদাবলির পরে।

ড. সুকুমার সেনের মতে : "বাংলায় বৈষ্ণব-পদাবলীর জন্ম জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী থেকে। ...তবে জয়দেবের পরে বাংলাদেশে লেখা কোনো পদ বা পদাবলীর সন্ধান পনেরো শতকের শেষ দশবছরের আগে নিশ্চিতভাবে মেলে না। কিন্তু তারপর থেকে পদাবলী-রচনায় একটু ভাঁটার টান দেখা যায়নি আধুনিককালের সীমানা পর্যন্ত।" তাঁর মতে, বাংলায় বৈষ্ণব-পদাবলি দুরকম ভাষায় রচিত—একটি খাঁটি বাংলা; আর একটি মিশ্র ভাষা, যেটি কতকটা প্রাচীন মৈথিলির মতো, যাকে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। একটু-আধুনিক অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠে লেখা প্রাচীন পদাবলির ধারাতেই জয়দেব তাঁর গানগুলি সংস্কৃতে লিখেছিলেন এবং সেগুলি "শুধু মিথিলায় বাংলায়, এবং আসামে নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্র-গুজরাটে, পঞ্জাবে ও রাজস্থানে বৈষ্ণব তথা আধ্যাত্মিক পদাবলীর পথ খুলে দিয়েছিল।" এগুলি মূলত গান হলেও গঠন, আকার ও বন্ধে গানের সঙ্গে মেলে না; তার ভাবটি সংহত, প্রগাঢ় অথচ স্বসম্পূর্ণ। সুষম ছন্দে লেখা এগুলির দ্বিতীয় পদটি 'ধুয়া', কবির স্বাক্ষর শেষ পদে থাকে, যাকে বলা হয় ভণিতা। ভণিতায় কেউ কেউ গুরুর নাম দিয়েছেন, যেমন : রূপগোস্বামী। দু-চার লাইনের পদ ও লেখা হত, সেগুলিকে বলা হত 'ধুয়াপদ'। বিদ্যাপতির কিছু ধুয়াপদকে আবার গোবিন্দদাস কবিরাজ বাড়িয়ে নিয়ে দুজনেরই 'ভণিতা' দিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণলীলাকে উপজীব্য করেই বৈষ্ণব-পদাবলি রচিত। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার পর্যায়-বিভাগ অনুসারেই কবিরা পদ লিখতেন। গোড়ার দিকে বিভিন্ন পর্যায় গৃহীত হয়েছে প্রাচীন রসশাস্ত্র ও সংস্কৃত কাব্য থেকে, পরবর্তীকালে নব্য বৈষ্ণব-অলংকার শাস্ত্র অনুসরণে। পর্যায়কে বাংলায় বলা যেতে পারে 'পালা'। রাধাকৃষ্ণের মিলনবিরহের সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্যের প্রধান পর্যায়গুলির মধ্যে পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, মান, প্রবাস বা মাথুর, আক্ষেপানুরাগ ইত্যাদি প্রধান। এগুলিকে উপজীব্য করে শতাধিক পদকর্তা পদ লিখেছেন, সেসব পদের সংখ্যা চার হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে কয়েকশো পদের কাব্যমূল্য আজও অপরিসীম। প্রথম শ্রেণীর সেসব কবিতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাগুলির পাশাপাশি অধিষ্ঠিত। এক-একটা পদ এক-একটি ভাব নিয়ে রচিত অপূর্ব গীতিকবিতা। পদাবলি পাঠ করে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়, রাধাকৃষ্ণের মিলনের পদ বেশি নেই, বিরহের আর্তি ও ব্যাকুলতাই অধিকাংশ পদে পরিস্ফুট।

দুই

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ হলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী পদকর্তা। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের আবির্ভাব আবার জয়দেবেরও দুশো-আড়াইশো বছর পরে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ধর্মে ও সমাজে তো বটেই, পদকর্তা কবিদের মধ্যেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। তাঁকে রাধাভাবযুক্ত স্বয়ং কৃষ্ণ বলে মনে করা হল, তাঁকে নিয়েও বহু কবিতা রচিত হল। চৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তারা হলেন : জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি। চৈতন্যের মৃত্যু ষোড়শ-শতকের প্রথমার্ধে (১৪৮৬-১৫৩৩); আর উক্ত পদকর্তাদের পদগুলি রচিত হয় ওই-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এরপর ১৭-১৮ শতকের মুখ্য কবিরা হলেন : ঘনশ্যাম, শশিশেখর, রাধামোহন, জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি। চৈতন্যদেবের অন্যতম পূর্ব নাম গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের ভাব অবলম্বন করে যে-পদগুলি রচিত হল, কীর্তনগানের সময় কৃষ্ণলীলার পালা আরম্ভ করার আগে সেগুলি গাওয়া হতে থাকল এবং গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি সেক্ষেত্রে ভাব ও ভাবনার দিক থেকে সমগোত্রীয় হত। তাই উক্ত পদগুলি 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে অভিহিত হল। পুরনো পদাবলি-সংকলনগুলিতে প্রত্যেক বিষয় ও রস পর্যায়ের পদাবলির শুরুতে একটি বা দুটি করে গৌরচন্দ্রিকা আছে।

পূর্বরাগের বর্ণনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তুলনাহীন। রূপানুরাগের ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস তেমনই অদ্বিতীয়। জ্ঞানদাসের বাংলা-পদগুলিতে চণ্ডীদাসের বাংলা-পদের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু কাব্যগুণে কোথাও কোথাও তিনি চণ্ডীদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন। অভিসার-বিষয়ক পদরচনায় গোবিন্দদাস বিখ্যাত। অন্ধকার রাত্রি, জ্যোৎস্নারাত্রি, প্রবল বৃষ্টির রাত—একরকম নানা পরিস্থিতিতে অভিসার নিয়ে বহু কবিই পদ লিখেছেন, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদগুলি ধ্বনি, ভাব, মিশ্রভাষার মজা, চিত্রকল্পের ব্যবহার—ইত্যাদির ফলে বস্তুতই অসাধারণ। মাথুর এবং আক্ষেপানুরাগ নিয়ে লেখা পদগুলি আবার বেশ প্রগোচ্ছল। মাথুর হল কৃষ্ণের মথুরা-প্রবাসের পর্যায়, আক্ষেপানুরাগ হল বিরহবেদনার প্রকাশের পর্যায়। এছাড়া পদগুলিতে নায়িকার আরও বিভিন্ন ভাব ও অবস্থা যেমন : কলহান্তরিতা (নায়কের সঙ্গে কলহ করে অনুতাপিনী), বাসকসজ্জিকা, (সেজেগুজে নায়কের প্রতীক্ষায়), বিপ্রলব্ধা (নায়ককে যথাস্থানে না পেয়ে নায়িকার হতাশা)—ইত্যাদি পরিস্ফুটিত হয়েছে নানাভাবে। সুফী ধর্মের (ইসলাম ধর্মেরই একটি শাখাবিশেষ) সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের মিল ছিল। শ্রীচৈতন্য আবার জাতিবর্ণ-ধর্মভেদ মানেননি। এর ফলে, বহু মুসলমান কবিও পদ লিখতে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলাওল, নাসির মামুদ বেশ বিখ্যাত। উল্লেখযোগ্য যে, এইসব পদাবলি কিশোর-বয়সের রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত এমনভাবে আলোড়িত করেছিল যে তিনিও বৈষ্ণব-পদের ভাব-ভাষা-রীতির অনুকরণে বেশকিছু পদ লিখেছিলেন। ভানুসিংহ ছদ্মনামে লিখতেন বলে সেগুলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে পরিচিত।

বৈষ্ণবমতে পাঁচটি রস হল : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণব-পদাবলিতে প্রথম দিকে বাৎসল্য-রস ছিল না। সখ্য রসও নয়। ষোলো-শতকে, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর আগে-পরে তাঁর ভক্তেরা তাঁর শৈশব নিয়ে কিছু পদ লিখেছিলেন, বৈষ্ণব-পদে বাৎসল্য রসের সেই প্রথম আগমন। সখ্যরসেরও আগমন ঘটে সেই সঙ্গেই। তবে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় অভিসার ও বিরহের বিষয়টিই বরাবর হৃদয়গ্রাহী, সখ্য ও বাৎসল্যরস তাকে কখনোই অতিক্রম করতে পারেনি। সুকুমার সেনের মতে, বৈষ্ণব-পদাবলির বিষয় তিনটি; কৃষ্ণলীলা, প্রার্থনা ও চৈতন্যলীলা। বৈষ্ণব-গোস্বামীরা যেহেতু চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ভাবতেন, তাই তাঁকে নিয়েও এত পদ লেখা হয়েছে।

তিন

কয়েকজন বিখ্যাত বৈষ্ণবকবির কথা এ-প্রসঙ্গে পৃথকভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমজন, অবধারিত ভাবেই **বিদ্যাপতি**। জয়দেবের আবির্ভাবকাল ১২-শতক, তাঁর শ-দুয়েক বছর পরে বিদ্যাপতির জন্ম। বাবা : গণপতি ঠাকুর। মিথিলা অঞ্চলের লোক। পঞ্চগৌড়ের রাজা শিব সিংহ বিদ্যাপতিকে সভাসদ্-কবিরূপে স্থান দিয়েছিলেন। সংস্কৃতে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি তৎকালে তাঁর পদগুলি লিখেছিলেন মৈথিলি ভাষায়। আশ্চর্য ঘটনা হল, বাঙালি না হয়েও, বাংলায় না লিখেও তিনি যুগ যুগ ধরে বাঙালির হৃদয় জয় করে এসেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব পর্যন্ত বিদ্যাপতির পদ শুনে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। চৈতন্যযুগের কিছু কবি তো বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে অভিনব একটি কাব্যভাষাই (ব্রজবুলি) তৈরি করে ফেলেন। ভাষার কারুকার্য, ছন্দের বিন্যাস, অলংকার ব্যবহারে নৈপুণ্য, শব্দের প্রয়োগে অসামান্য চিত্রকল্পনির্মাণ—এসবের কারণে বিদ্যাপতি একজন প্রথমশ্রেণীর কবি। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলাসংগীতগুলিতে ভক্তসাধকের তন্ময়তার চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক সংসারের প্রণয়াসক্ত নরনারীর মিলনবিরহের ভাবটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। দেহাতীত ভগবৎপ্রেম ও তজ্জনিত আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা বিদ্যাপতির পদে ততটা পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন : রাধা নামটির সাধারণ অর্থ ছিল প্রেয়সী। আর কৃষ্ণ নাম নিলে অননুমোদিত প্রেমের অবৈধতা কেটে যায়। বিদ্যাপতির পদের কয়েক পঙ্‌ক্তি উদাহরণ :

১. আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।।
আজু মজু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল
টুটল সকল সন্দেহা।।

২. মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এদেহ সমর্পিলুঁ
দয়াজনু ছোড়বি মোয়।।
গণইতে দোষগুণ লেশ না পায়বি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহ মুঞি ছার।।

চণ্ডীদাস : বীরভূমের নানুরে জন্ম। বাবা : দুর্গাদাস বাগচি। জন্মকাল সঠিক জানা যায় না। এ-নামে বেশকিছু পদকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তারমধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসকে আলাদাভাবে জানা গেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকে ১৪ শতকের প্রথম দিকের লোক বলে অনুমান করা হয় অর্থাৎ চৈতন্য-পূর্ববর্তী। ইনি ছাতনা (বাঁকুড়া জেলা) নিবাসী ছিলেন বলে অনুমান। 'দ্বিজ' 'বড়ু', 'দীন' ও শুধু 'চণ্ডীদাস' নামে বহু পদকর্তা পদ লিখে গেছেন।

বীরভূম-নিবাসী দ্বিজ চণ্ডীদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় পরকীয়া প্রেমের কথা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তাঁর পদে। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গান শুনে মুগ্ধ হতেন। সুতরাং এটা ঠিক যে, এই চণ্ডীদাসও চৈতন্য-পূর্ববর্তী। পরকীয়া সাধনার পন্থাটি তৎকালে সখী-অনুগত বা রাগাত্মিক নামে পরিচিত ছিল, পরবর্তীকালে তার নাম হয় রসসাধনা পদ্ধতি। বিদ্যাপতি-জয়দেব-চণ্ডীদাস, তিনজনই এই রসের কবি এবং এঁরা 'রসিক' হিসাবে পরিগণিত। এই কল্পনায় রামী নামে চণ্ডীদাসের এক সাধনসঙ্গিনীর কথাও খুব প্রচলিত।

অল্পকথায়, সহজভাষায়, প্রাণের গভীর কথাকে, প্রেমের নিগূঢ় ভাবকে, বাকচাতুর্য ছাড়াই চণ্ডীদাস যেভাবে তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে তিনি বিদ্যাপতির তুলনায় স্বতন্ত্র তো হয়ে উঠেছেনই, তাঁর কবিতাগুলিও হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী।। উদাহরণ :

১. সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।

২. বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরানে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলুঁ দাসী।।

জ্ঞানদাস : ইনিও চণ্ডীদাসের মতোই গভীরতম অনুভূতিকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এঁকে অনেকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলেও অভিহিত করেন। আনুমানিক ১৫২০ থেকে ১৫৩৫ খিষ্টাব্দের মধ্যে বা ওই সময়ের কাছাকাছি জ্ঞানদাসের জন্ম। জাতিতে ব্রাহ্মণ জ্ঞানদাসের বাস ছিল বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে; এটি আগে বীরভূমের অন্তর্গত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জ্ঞানদাসকে নিত্যানন্দ শাখার কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসই প্রথম 'ষোড়শ গোপাল'-এর রূপ বর্ণনা করে পদরচনা করেছেন। সংগীতজ্ঞ ছিলেন, নতুন একধরনের কীর্তন-রীতির উদ্ভাবকও তিনি। তাঁর পদের ভাষা ব্রজবুলি।

উদাহরণ :

১. রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে।।
সই কি আর বলিব।

২. সুখের লাগিয়া এ-ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।

গোবিন্দদাস (আনুমানিক ১৫৩৭-১৬১৩) : শ্রীচৈতন্যের সহচর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শ্রীখণ্ডবাসী মহাকবি দামোদর কবিরাজের দৌহিত্র। পৈতৃক নিবাস : মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া-বুধুরি গ্রাম (ভগবানগোলার কাছে)। শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি পদরচনা শুরু করেন। জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের ধারার কবি, গোবিন্দদাস তেমনই বিদ্যাপতির ধারার। বাইরের প্রকৃতি এবং অন্তরের প্রকৃতি—উভয় বর্ণনাতেই গোবিন্দদাস অসাধারণ। শব্দের প্রয়োগে, অল্পকথায়, বিচিত্রধর্মী পদরচনায় গোবিন্দদাস পাঠক ও শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন অনায়াসে। অভিসারের পদরচনায় তো তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার—সবেতেই।

উদাহরণ :

১. শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্লমল্লিকা মালতী যুথী
মত্তমধুকর-ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহনমদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত চোরণি।

২. মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহি অতি দূরতর বাদলদোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুধুনী পার।।

বলরামদাস : বৈষ্ণবসাহিত্যে একাধিক বলরাম দাসের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে নিত্যানন্দপ্রভুর অন্যতম প্রিয় পার্ষদ বলরামদাস, যাঁর নাম বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে উল্লেখিত, তিনিই প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলরামদাস। এঁর রচিত পদগুলিতে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার উদাহরণ স্বরূপ দেখিয়েছেন, বলরামদাসের এই যে পঙ্‌ক্তি "কিন্নরে করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদুগান"—এর থেকে বোঝা যায় চৈতন্যদেব সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বিদ্যাপতির রীতি অনুসরণ না করে বলরামদাস চণ্ডীদাসের ধারায় সহজ-সরল ভাষায় সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বেশকিছু পদ লিখেছেন। তাঁর পদ থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি :

১. কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মুরতি-মরকত অভিনব কাম।।
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে।।

২. চান্দমুখে দিয়া বেণু নাম লৈয়া সব ধেনু
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।।

বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড-নিবাসী আত্মারাম দাসের পুত্র আর-একজন বলরামের জন্ম ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "প্রেমবিলাস, ; এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ—গৌরাঙ্গষ্টক, বীরচন্দ্ররচিত, রস-কল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত প্রভৃতি। এঁর গুরুপ্রদত্ত নাম নিত্যানন্দ। এঁর পদগুলি গবেষক-আলোচকদের মতে, নিতান্তই সাধারণ।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী : গোবিন্দদাস কবিরাজের মতোই ইনিও প্রথম শ্রেণীর কবি। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। এঁর অধিকাংশ রচনা বাংলায়; ব্রজবুলিতেও লিখেছেন তবে তাতেও বাংলার ভাগটি অধিক। নমুনা :

১. পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা।
পিয়া বিনু না খায় উড়ি বুলে তারা।।
মো যদি জানিতুঁ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতুঁ বাঁধিয়া।।

২. আমি কুরূপিনী গুণহীনী গোপনারী।
তুমি জগজনরঞ্জন বংশীধারী।।
আমি কুলটা কলঙ্ক সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রসপণ্ডিত রস-চূড়ামণি।।

নরোত্তম দাসঠাকুর [১৫৩৮-১৫৮৭] জন্মস্থান : খেতুরী-গড়েরহাট, রাজশাহী পরগনা। বাবা : কৃষ্ণানন্দ দত্ত। বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্র শিখে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিলাভ করেন। তাঁর রচিত সুর-প্রয়োগে একপ্রকার রস-কীর্তন প্রচলিত হয়, তা গড়েরহাটি বা গড়ানহাটী কীর্তন নামে পরিচিত।

পদের নমুনা :

কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ কোটি হেম
নিরবধি জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি তেঞি পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের তরে।।

লোচনদাস (ষোড়শ শতক) : পুরোনাম : লোচনানন্দ দাস। বর্ধমানের কোগ্রামে জন্ম। বাবার নাম : কমলাকর দাস। মা : সদানন্দী। ইনি শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। ১৬ শতকের মাঝামাঝি রচিত এঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি লিখিত হয় বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবমত'-এর পরবর্তীকালে, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এর পূর্বে। গ্রন্থটিতে চারটি খণ্ড, মোট এগারো হাজার পঙ্‌ক্তি; এই চৈতন্য-জীবনী কাব্যটি পাঁচালির রীতিতে রাগরাগিণীর উল্লেখসহ লিখিত। কাব্যটির বিশেষত্ব হল, এতে গৌরনাগর ভাব এবং সেই প্রকার সাধনভজন পদ্ধতি প্রচারিত। এই গ্রন্থেই চৈতন্যের তিরোধান বিষয়ে বলা হয়েছে, চৈতন্যদেব জগন্নাথ-দেহে লীন হন। এমনকি চৈতন্যদেবের অবতারতত্ত্ব বিষয়েও নতুন

ধরনের ব্যাখ্যা আছে এতে। কবি ও গীতিকার হিসাবেও লোচনদাসের খ্যাতি অবিসংবাদিত। তাঁর রচনার উদাহরণ :

গুঞ্জ-অলি পুঞ্জ বহু কুঞ্জে রহু মাতিয়া।
মত্ত পিক- দত্ত রবে ফাটে মঝু ছাতিয়া।।
বল্লীযুত মল্লীফুল- গন্ধসহ মারুতা।
কুঞ্জকলি- শৃঙ্গ অলি- বৃন্দ কাহে নৃত্যতা।।
সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া।
কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া।।

শশিশেখর : ১৮ শতকের শেষ-দিকের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। সুকুমার সেনের ভাষায় : "গানের ভাষায় প্রসন্নতা, ঢঙে নবীনতা এবং ছন্দে নমনীয়তা এনে ইনি কীর্তনগানে নবজীবন সঞ্চার করিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত কীর্তনগানে গোবিন্দদাসের পরেই শশিশেখরের মর্যাদা।" তাঁর পদের থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি :

নখরক্ষত বক্ষসি তুয়া
দেয়ল কোন নারী।
কণ্টকে তনু ক্ষতবিক্ষত
তুহে চুঁড়ইতে গোরী।।

শেখর : ১৬-শতকের প্রথম ভাগের কবি। এঁর পদের উদাহরণ :

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
গগন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন-খর-শর হন্তিয়া।।
সখি হে হামার দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেনের বক্তব্য, এই পদটি বিদ্যাপতির নামে চলে আসছে, কিন্তু প্রাচীনতম উদ্ধৃতি-অনুযায়ী তাতে প্রচলিত পাঠের ভণিতা সঙ্গতি ও লালিত্যহীন বোধ হয়। গানটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুর দিয়েছিলেন।

এ-ছাড়াও বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কিছু পদকর্তার নাম : **গোপাল দাস**—পুরো নাম রামগোপাল দাস, ইনি ১৭-শতকের মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। এঁর 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' গ্রন্থে বৈষ্ণব-অলংকারশাস্ত্র অনুসারে নায়ক-নায়িকার ভাব ইত্যাদির বিচার আছে। সুকুমার সেন ওই গ্রন্থটিকে পদাবলী-সংকলনের প্রথম পদক্ষেপ বলেছেন। এঁর পদের নমুনা :

ফুলের গেড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ যুগ-কুচে বসন ঘুচে
মুচকি মুচকি হাস।।

চন্দ্রশেখর : এঁকে কেউ-কেউ শশিশেখরের ভাই বলে মনে করেন। এঁর পদের নমুনা :

জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর
চলত সো বরনারী।
বংশীবট যাবট-তট
বনহি বন হেরি।।
মদন কুঞ্জে শ্যামকুণ্ড
রাধাকুণ্ড-তীরে।
দ্বাদশ বন হেরত সঘন
শৈলই কিনারে।।

জগদানন্দ দাস : ১৭-শতকের মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। এঁর সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, কবিদের সুবিধে হবে বলে তিনি সমধ্বন্যাত্মক শব্দের একটি কোষ রচনায় হাত দিয়েছিলেন : শব্দার্ণব। এ-জাতীয় গ্রন্থ আজও বাংলাভাষায় পাওয়া যায় না। ইংরেজিতে এধরনের বই আছে, সেগুলিরও প্রকাশকাল নিতান্তই আধুনিক। এঁর পদের নমুনা :

মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ/মধুপশব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ/কুঞ্জরগতি-গঞ্জি গমন/ মঞ্জুল কূলনারী।

ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ/মালতীফুল-মালে রঞ্জ/অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী/ খঞ্জনগতি হারী।।

দীনবন্ধু দাস (১৮ শতক) : গোপাল দাস, জগদানন্দ ঠাকুর প্রমুখের ন্যায় ইনিও শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-বংশীয়ের শিষ্য। 'সংকীর্তনামামৃত' নামে পদ-সংকলনের রচয়িতা।

নরহরি দাস সরকার ঠাকুর (১৪৭৮-১৫৪০) : বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে জন্ম। ইনিই গৌরলীলাত্মক কবিতা প্রথম রচনা করেন। লোচনদাস এঁরই শিষ্য। এঁর বাবা নারায়ণ দাস গৌড়ে রাজবৈদ্য ছিলেন। নরহরির দাদা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনও চৈতন্যের স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীখণ্ডের গুরুবংশের সূত্রপাত ঘটে নরহরি ও রঘুনন্দন থেকেই। গৌড় ও রাঢ়-অঞ্চলের যোগসূত্র ছিল এঁদেরই অবদান। নরহরির পদাবলিকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায় : রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, গৌরবিষয়ক এবং গৌর-নাগর ভাব বিষয়ক। ইনি চণ্ডীদাসের ভাষা ও রীতি অনুযায়ী পদ রচনা করেছেন। "সই, কেমনে ধরিবে হিয়া'/আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়/আমার আঙিনা দিয়া।।"—ইত্যাদি পদে চণ্ডীদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রেমদাস : প্রকৃত নাম : পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দিরের রান্নাঘরে কাজ করতেন। কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক অবলম্বনে লেখা এঁর কাব্য 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' (১৭১২)। বাগনাপাড়ার পাটের সাধনমার্গের গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা' (১৭১৬) এঁর লেখা।

যদুনন্দন দাস : শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। আচার্য-কন্যা হেমলতা ও আচার্যের জীবনী-অবলম্বনে লিখেছিলেন 'কর্ণানন্দ'। রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যের বাংলা-অনুবাদক।

নরহরি চক্রবর্তী : অপর নাম ঘনশ্যাম। দুটি নামই ভণিতায় ব্যবহার করেছেন। ইনি বৃন্দাবনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়েন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও জ্ঞানলাভ করেন। তিনটি বৈষ্ণব-ইতিহাস গ্রন্থ ছাড়াও সংস্কৃতে সংগীত শিক্ষার বই ও বাংলায় একটি ছন্দশাস্ত্রের বইয়েরও লেখক। 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে একটি বিশাল পদাবলি সংকলন করেছিলেন। প্রাকৃতপৈঙ্গল-অনুযায়ী বিচিত্র ছন্দ-রচনায় নরহরি দক্ষ ছিলেন। পয়ার-ত্রিপদীতে লেখা 'ভক্তিরত্নাকর' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৮-শতকের গোড়ার দিক বলে অনুমান। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছে সৈদাবাদ গ্রামে জন্ম।

মুরারি গুপ্ত (১৬ শতক) : জন্ম শ্রীহট্ট। এঁর বাবা অচ্যুতানন্দ। ত্যাগ করে নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে চলে আসেন। চৈতন্যজীবনীর আদিগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' বা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'-র লেখক। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দ। গ্রন্থটি মহাকাব্যের ধারায় বলেই স্বীকৃত। এতে রয়েছে চারটি উপক্রম, ৭৭টি সর্গ, মোট সংস্কৃত-

শ্লোকের সংখ্যা ১৮৫০০। কবি কর্ণপূর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ—প্রমুখ মহাকবিগণও মুরারির গ্রন্থটিকে নবদ্বীপ-লীলাপ্রসঙ্গের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং চৈতন্য-জীবনী লিখতে গিয়ে এই গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের ছেলেবেলার কথা, তাঁর নবদ্বীপলীলা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহজস্বাভাবিকতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতাকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন খুব শিল্পিতভাবে। বাংলায় ও ব্রজবুলিতে তিনি বেশ কিছু পদ লিখেছিলেন। কিন্তু সবগুলি পাওয়া যায় না।

রামানন্দ বসু : ১৬ শতকের কবি মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ, তাঁর পুত্র রামানন্দ। মালাধরের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে হুসেনশাহ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন। সত্যরাজও পদবি 'খান' লিখতেন। রামানন্দ ও তাঁর বাবা দুজনেই পুরীতে চৈতন্যের স্নেহধন্য হন। রামানন্দের পদে জ্ঞানদাসের প্রভাব আছে।

কয়েক পঙ্‌ক্তি :

শাঙন মাসের দে রিমিঝিমি বরিষে/নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামলবরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর/মুখ ধরি করয়ে চুম্বন।।

বাসুদেব ঘোষ : উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্ম। তাঁর দুই দাদা গোবিন্দ এবং মাধব-ও বিখ্যাত কবি ও কীর্তনিয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন : বাসু ঘোষের পদ শুনে কাঠ-পাথরও গলে যায়। বাসুদেব ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাস সংক্রান্ত পদগুলি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে সেগুলিকে অবলম্বন করে বহু পালাগান বাঁধা হয়েছিল। বাসুদেবের মূল্যবান অবদান হল, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব নিয়ে এ-ব্যাপারে বর্ণনা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ছাড়া আর-কোথাও কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এঁর পদে শচীমাতা বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী : জন্ম : মুর্শিদাবাদ জেলার দেবগ্রাম। বাস ছিল সৈদাবাদে। ১৬৭৯ থেকে ১৭০৪—এই ২৫ বছর তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। বহু গ্রন্থ লিখেছেন : ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' গীতার 'সারার্থবর্ষিনী', উজ্জ্বল নীলমণির 'আনন্দচন্দ্রিকা', ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ভক্তিসার প্রদর্শিনী', দানকেলিকৌমুদীর 'মহতী', গোপালতাপনীর 'ভক্তবর্ষিণী', আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর 'সুখবর্তনী' এবং অলংকার কৌস্তুভের 'সুবোধিনী'—এ তো গেল টীকাভাষ্য; সংস্কৃতে কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও লিখেছেন। এছাড়া স্তবামৃতলহরী, গৌরাঙ্গলীলামৃত, চমৎকারচন্দ্রিকা গ্রন্থগুলিও তাঁর রচনা। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত কাব্যটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পণ্ডিতদের মত। বিশ্বনাথের পদগুলি অধিক প্রচলিত না-হওয়ার কারণ, ভাষা ঠিক সহজ সরল নয়। সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, এঁর কাছে গান শিখেছিলেন শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামনি নামে একটি পদাবলি-সংকলনও করেছিলেন। পরকীয়া তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন।

ঘনশ্যাম কবিরাজ : গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র; পিতা দিব্যসিংহ। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। পিতামহের রচনারীতি অনুসরণ করলেও এঁর পদগুলি অতটা হৃদয়স্পর্শী নয়, কিন্তু অত্যন্ত ভাবসমৃদ্ধ। এঁর লেখা 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' বিখ্যাত গ্রন্থ, ওতে রসশাস্ত্রের তত্ত্বও বর্ণিত। ওই গ্রন্থে তাঁর নিজের ২৫টি পদও অন্তর্ভুক্ত।

আরও অজস্র বৈষ্ণব-কবি রয়েছেন : খ্যাত, অল্পখ্যাত, অখ্যাত—এঁদের মিলিত সৃজনকর্মেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব সাহিত্য। যথা : উদ্ধব দাস, রূপগোস্বামী, বীর হাম্বির, বিপ্রদাস ঘোষ, সৈয়দ মর্তুজা, বংশীদাস প্রভৃতি। এ-প্রসঙ্গে অবশ্যপাঠ্য কয়েকটি গ্রন্থ :

(১) বৈষ্ণব-পদাবলী : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; (২) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু : সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত; (৩) শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী : মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত; (৪) ষোড়শ-শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য; বিমানবিহারী মজুমদার; (৫) বৈষ্ণব-পদাবলী : সুকুমার সেন সংকলিত।

চার

পদাবলি-সংকলনগ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো **'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'**—রচয়িতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৭ শতকের শেষদিক। কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে শুরু করে পূর্ণিমা পর্যন্ত ৩০টি ক্ষণদা অর্থাৎ রাত্রে গান-করবার উপযুক্ত ৩১৫টি পদ এতে সংকলিত। তার মধ্যে ৭টি পদ দু-বার করে রাখা হয়েছে। আজ আমরা গঙ্গারাম, গিরিধর দাস, বিদ্যাবল্লভ, দামোদর, বাসুদেব দত্ত, শংকর ঘোষ ও মহেশ বসুর মতো বৈষ্ণব কবিদের যেটুকু পরিচয় পাচ্ছি, তা এই সংকলন-গ্রন্থের কল্যাণেই। এ-সংকলনে রয়েছে ৪৮ জন কবির ভণিতাযুক্ত ২৯৩টি ও ভণিতাছাড়া ২২টি পদ। এই গ্রন্থ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় : প্রতি রাত্রে প্রথম গৌরচন্দ্রিকা ও পরে নিত্যানন্দচন্দ্রিকা গেয়ে কৃষ্ণলীলা শুরু হত। নিত্যানন্দচন্দ্রিকা গাইবার রীতি অন্যত্র পাওয়া যায়নি।

'পদামৃতসমুদ্র'—গ্রন্থের সংগ্রাহক রাধামোহন ঠাকুর [আনুমানিক ১৬৯৮-১৭৬৮]; এঁর বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের মালিহাটি গ্রামে। ইনি ছিলেন আলংকারিক রীতির কবি। ইনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদরচনায় নিপুণ ছিলেন। পরকীয়াবাদের সমর্থক ছিলেন। বাংলা-পদাবলির সংস্কৃত টীকা লিখেছেন। এঁর গ্রন্থটিতে মোট পদ ৭৪৬ : তার মধ্যে ২২৮টি নিজের রচনা। গোবিন্দদাসের ২৭০টি পদ তাঁর গ্রন্থে সংকলিত। এঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্যামানন্দ পুরী আর অন্যতম শিষ্য ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার।

'গীতচন্দ্রোদয়'-এর সংকলয়িতা নরহরি চক্রবর্তী, যিনি ঘনশ্যাম নামেও পরিচিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অন্যতম শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র। এঁর গ্রন্থে ১১৭০টি পদ, সকলই পূর্বরাগবিষয়ক। পদগুলির মধ্যে ৮২৮টি তাঁর নিজেরই লেখা। **'সংকীর্তনামৃত'**-সংকলক দীনবন্ধু দাসের পরিচয় অন্যত্র আছে। এ-গ্রন্থটি ১৮-শতকের প্রথম দিকের। মোট ৪৯৪টি পদের মধ্যে দীনবন্ধুর নিজের লেখাই ২০৭টি। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির অনুলিপি করা একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়।

গৌরসুন্দর দাসের **'কীর্তনানন্দ'** গ্রন্থে (১৭৬৮) ১১১৯টি পদ আছে। ১৮০০ এবং ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে লেখা এ-গ্রন্থের দুখানা সম্পূর্ণ পুঁথিও পাওয়া গেছে।

পদকল্পতরু : সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সবচেয়ে বিখ্যাত সংকলন-গ্রন্থ। সংকলক গোকুলানন্দ সেন এ-গ্রন্থে রেখেছেন ৩১০১টি পদ; নিজের মাত্র ২৬টি। এতে গোবিন্দদাসের ৪৬০টি, জ্ঞানদাসের ১৮৬টি ও রাধামোহন ঠাকুরের ১৮২টি পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গোকুলানন্দ সুপরিচিত বৈষ্ণবদাস নামে। ইনি ছিলেন রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। বাড়ি ছিল কাটোয়া-অঞ্চলে। পদকল্পতরু (বা গীতকল্পতরু) গ্রন্থের রচনাকাল ১৮ শতক। সংকলন-গ্রন্থটি চারটি শাখায় বিভক্ত; শাখাগুলি আবার পল্লবে বিভক্ত। বৈষ্ণবদাস বহুস্থান ঘুরে-ঘুরে পদগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

পদরত্নাকর : এ-সংকলনের ৪৩টি তরঙ্গে পদসংখ্যা ১৩৫৮; প্রকাশকাল

১৮০৬। সংকলক কমলাকান্ত দাস ছিলেন বর্ধমান জেলার সিউর গ্রামের লোক। নিমানন্দ দাস-সংকলিত **'পদরসসার'** গ্রন্থে পদের সংখ্যা ২৭০০; তার মধ্যে ৬৫০ পদ 'পদকল্পতরু'-তেও নেই। 'পদকল্পতরু'-তে নেই, এমন কবি অনেক রয়েছেন, যেমন : শশিশেখর, চন্দ্রশেখর, প্রমুখ। গৌরীমোহন দাস সংকলিত **'পদকল্পলতিকা'** (১৮৪৯) গ্রন্থে মোট ৩৫১টি পদের মধ্যে উক্ত কবিরাও রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার-দুজনে মিলে সম্পাদনা করেন **'পদরত্নাবলী'** (১৮৮৫)। **'পদামৃতমাধুরী'**-তে রয়েছে ২৩৫৬টি পদ। এই সংকলনটি নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী (১৮৬৮-১৯৫২)-র সহযোগিতায় সম্পাদনা করেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, (রায়বাহাদুর) [১৮৮০-১৯৬১]।

গৌরপদতরঙ্গিণী : ৮০ জন প্রাচীন বৈষ্ণব কবির মোট ১৫১৭টি পদ এই গ্রন্থে সংকলিত। প্রকাশিত হয় ১৩১০ বঙ্গাব্দে। এটির রচয়িতা জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২-১৯০৬) ইতিপূর্বে (১২৮০ বঙ্গাব্দে) বিদ্যাপতির পদাবলির সংকলন 'মহাজন-পদাবলী সংগ্রহ' প্রকাশ করেছিলেন। ইনি নিজেও পদ লিখেছেন। পেশায় ছিলেন স্কুলশিক্ষক। বৈষ্ণব-কবিদের জীবনী খোঁজার ব্যাপারে ইনিই প্রথম অগ্রণী হন।